## রাজ্যবিস্তার

আইহোল লিপিতে হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তরপথনাথ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই অভিধার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে হলে তাঁর রাজ্যবিস্তার নীতির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। গুপ্ত রাজকন্যার পৌত্র হিসেবে হর্ষবর্ধনের স্বপ্ন ছিল যে তিনি গুপ্তসাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করে এক রাজছত্রতলে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের ঐক্যসাধন করবেন। তাই তিনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলি জয় করে সাম্রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সময় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ তেমন শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। রোমিলা থাপার এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, গুপ্ত শাসনকালে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল হর্ষবর্ধনের সময় তা আরও বৃদ্ধি পায়।

হর্ষবর্ধন প্রথমেই শশাঙ্ক বিরোধিতায় লিপ্ত হন। হর্ষচরিতে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি প্রথমেই বিপন্না ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করে গৌড়ের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। বৌদ্ধ গ্রন্থ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বলা হয়েছে তিনি কর্ণসুবর্ণ অধিকার করে শশাঙ্ককে কার্যত বন্দী করে রাখেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার বৌদ্ধগ্রন্থটির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ এটি অনেক পরবর্তীকালের রচনা ও বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে প্রায়শই শশাঙ্ক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হত। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, শশাঙ্ক অন্তত পক্ষে ৬১৯খ্রীঃ পর্যন্ত এমনকি তার পরেও রাজত্ব করেন। অতএব শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের অভিযান কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের সম্পর্ক নিয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্য অধিকার করেন। ৬২৯ খ্রীঃ-এ শশাঙ্ক 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি পরিত্যাগ করেন। উড়িষ্যার গঞ্জামের ওপর তাঁর কোনো অধিকার ছিল না। তাঁর স্বর্ণমুদ্রার মানেরও অবনতি ঘটে। আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীঃ-এ শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মতের বিরোধিতা করে দেখিয়েছেন ৬৩৭ খ্রীঃ-এ হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধগয়া পরিদর্শনে গিয়ে শুনেছিলেন যে সম্প্রতি শশাঙ্ক সেখানে বোধিবৃক্ষের ক্ষতিসাধন করেছেন। ৬১৯ খ্রীঃ ও তার দীর্ঘকাল পরেও গৌড়, মগধ, বুদ্ধগয়া, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে শশাঙ্ক সগৌরবে রাজত্ব করেছেন। হর্ষবর্ধন এই অঞ্চলগুলি সম্ভবত ৬৩৭ খ্রীঃ-এ শশাঙ্কের

মৃত্যুর পর অধিকার করেন। ভাগিরথী ও পদ্মার পূর্বদিকের অঞ্চল ভাস্করবর্মন দখল করেন।

হিউয়েন সাঙের বিবরণে বলা হয়েছে, ক্রমাগত ছ'বছর যুদ্ধ করে হর্ষবর্ধন 'পঞ্চভারত' জয় করেন, অর্থাৎ পাঞ্জাব, কনৌজ, গৌড়, মিথিলা ও কলিঙ্গ। কিন্তু অন্য কোনো সূত্র থেকে এ তথ্য সমর্থিত হয়নি। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের পর হর্ষবর্ধন সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের মৈত্রকরাজ ধ্রুবসেনকে পরাস্ত করে বলভীরাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু ধ্রুবসেন তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে হর্ষবর্ধন নিজকন্যার সঙ্গে বলভীরাজের বিবাহ দিয়ে তাঁকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার অধিকার দেন। বলভী হর্ষবর্ধনের মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। এছাড়া আনন্দপুর, কচ্ছ, দক্ষিণ কাথিয়াওয়াড় হর্ষবর্ধনের প্রভাবধীন অঞ্চলে পরিণত হয়। হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধনের সিন্ধু অভিযানের কথা বলা হলেও হিউয়েন সাঙ তাকে স্বাধীন দেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধনের তুষারশৈল অভিযানের উল্লেখ আছে। এর দ্বারা কেউ নেপাল ও কাশ্মীরকে বুঝিয়েছেন, কেউ আবার বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের মতো পর্বতীয় ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

হর্ষবর্ধন যখন উত্তরভারতে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত সেই সময়ে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী দাক্ষিণাত্যে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন। নর্মদার উত্তরে রাজপুতানা ও গুজরাট পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত হর্ষবর্ধনের রাজ্য বিস্তৃত হলে তা চালুক্য সীমান্তকে স্পর্শ করে। হর্ষবর্ধন ও পুলকেশীর মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ৬৩৪ খ্রীঃ-এ হর্ষবর্ধন চালুক্যরাজের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে দক্ষিণভারত বিজয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

চালুক্যদের আইহোল লিপিতে হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তরপথনাথ' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কে. এম. পানিক্কর বলেছেন, বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরদিকের সবদেশ, নেপাল ও কাশ্মীর হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। রাধাকুমুদ মুখার্জি মন্তব্য করেছেন, সব সম্ভাব্য দিক বিচার করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তরভারতের সার্বভৌম সম্রাট হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এ অভিমত মানেন না। তিনি মনে করেন হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা সম্পর্কে বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। প্রকৃত রাজ্যসীমা এই ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। *প্রথমত*, হর্ষবর্ধন উত্তরাধিকার সূত্রে থানেশ্বর ও পূর্ব পাঞ্জাব লাভ করেন। *দ্বিতীয়ত*, ভগ্নীর সূত্রে তিনি কনৌজ, দোয়াব ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল অধিকার করেন। *তৃতীয়ত*, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি মগধ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও গঞ্জাম অধিকার করেন। বাণভট্ট বর্ণিত পঞ্চভারতের সঙ্গে এই রাজ্যসীমা সঙ্গতিপূর্ণ। এই অঞ্চলগুলির ওপর তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল কিনা তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ আছে। এই পরিসীমার বাইরে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, রাজপুতানা, নেপাল, কাশ্মীর, পূর্ববঙ্গ ও কামরূপের মতো অঞ্চল হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বলা হয়ে থাকে যে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে তাঁর কৃতিত্বকে অতিরঞ্জিত করার উদ্দেশ্যেই তাঁকে 'সকলোত্তরপথনাথ' অভিধায় ভূষিত করেছেন। প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে বলা যায় যে হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তরভারতকে সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সমর্থ না হলেও সেখানকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর প্রভাবাধীন ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা সমুদ্রগুপ্তের মত বিশাল সাম্রাজ্য গঠনে অসমর্থ হলেও গুপ্তোত্তর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার যুগে ও হূণ আক্রমণের কালে তিনি কিছুকাল অন্তত উত্তরভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখতে সক্ষম হন।